সেনবংশের শাসন ঃ

একাদশ শতকের অন্তিমভাগে বাংলাদেশে সেনবংশের উত্থান বাংলার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। সেনরাজাদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলায় আসেন বলে অনেকের ধারণা। বিজয় সেনের 'দেওপাড়া লেখ'তে বলা হয়েছে যে, দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের অন্যতম ***বীরসেন*** ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ।[১] সেনরাজাদের লিপিতে তাঁরা নিজেদের 'ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয়, তাঁরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে ক্ষত্রিয়তে পরিণত হন। বংশপরিচয়ের মতো এঁদের বাংলায় আবির্ভাব সম্পর্কেও মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে, একাদশ শতকে কর্ণাটের চালুক্যরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, তখন তাদের সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে সেনরা বাংলায় আসেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আবার অনেকের মতে, রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনীর সদস্যরূপেই সেনরা প্রথম বাংলায় আসেন। কেউ কেউ মনে করেন, সেনবংশীয় ব্যক্তিরা পালরাজাদের আমলে উচ্চ-রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে এদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সামন্ত সেন ছিলেন সেন-কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তবে তিনি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর পুত্র ***হেমন্ত সেন*** প্রথমে রাঢ় অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। হেমন্ত সেনের পুত্র ***বিজয় সেনের*** আমলে সেনবংশ বাংলায় স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

বিজয় সেন ঃ বিজয় সেনের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য নির্ভরযোগ্য উপাদান হল 'ব্যারাকপুর তাম্রশাসন' ও 'দেওপাড়া প্রশস্তি'। রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে বিজয় সেন বাংলার ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি রাঢ়ের শূরবংশীয়া রাজকন্যা ***বিলাসদেবীকে*** বিবাহ করে নিজের হাত শক্ত করেন। রাজ্যারম্ভের প্রথম দিকেই তিনি বর্মন রাজাদের পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ নিজ অধিকারে আনেন। কারণ প্রথমদিকের 'সেন লেখ'তে *'বঙ্গে বিক্রমপু ভাগে'* কথাটি পাওয়া যায়।

'দেওপাড়া লিপি'তে বলা হয়েছে যে, বিজয় সেন গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গরাজকে এবং নান্য, রাঘব, বীর ও বর্ধন নামক কয়েকজন নরপতিকে পরাজিত করেছিলেন। বর্ধন ও বীর হলেন রামচরিতে উল্লিখিত দোরপবর্ধন ও বীরগুণ। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে কৌশাম্বী ও কোটাটবীর সামন্ত নৃপতি। নান্য ছিলেন মিথিলার শাসক নানাদেব। রাঘবের প্রকৃত পরিচয় অনিশ্চিত। অনেকে মনে করেন, এই রাঘব

১. *পাল-সেন বংশানুচরিত (পৃষ্ঠা ১১৩)।*

Scanned by CamScanner

ছিলেন কলিঙ্গরাজ অনন্ত বর্মন চোড়গঙ্গের পুত্র। বিজয় সেনের কাছে পরাজিত গৌড়রাজ ছিলেন সম্ভবত মদনপাল। তবে বিজয় সেন গৌড় বিজয় সমাপ্ত করেননি বলেই মনে হয়। কারণ বল্লাল সেনও নয়, একমাত্র লক্ষ্মণ সেনই 'গৌড়েশ্বর' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। কলিঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। লক্ষ্মণ সেন পুরীতে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই কাজ যদি তিনি নিজ রাজ্যকালে স্বাধীনভাবে করে থাকেন, তবে কলিঙ্গজয়ের কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই। পূর্ববাংলা জয়ের পর আসামে অভিযান করা, বা তার একাংশ দখল করা হয়তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তবে অনেকে মনে করেন, কামরূপরাজই বঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন, বিজয় সেন সেই আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করেছিলেন।

রামপাল পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নদশার সুযোগে *বিজয় সেন*-ই বাংলায় সেনবংশের ভিত্তিপ্রস্তর মজবুত করেন। পরাক্রান্ত রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। 'ব্যারাকপুর তাম্রশাসন' থেকে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘ ৬২ বছর (১০৯৬-১১৫৮ খ্রিঃ) রাজত্ব করেছিলেন। তিনি দেওপাড়ায় প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও 'অরিরাজ বৃষভশংকর' উপাধি নেন। ড. *মজুমদারের* মতে, বিজয় সেনের নেতৃত্বে বাংলায় সুদিনের সূচনা হয়েছিল।

❂ বল্লাল সেন ঃ বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র *বল্লাল সেন* সিংহাসনে আরোহণ করেন। *'নৈহাটি পট্ট'* ও *'বল্লালচরিত'* গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজ্যকাল সম্পর্কে জানা যায়। অবশ্য বল্লালচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহাতীত নয়।

'বল্লালচরিত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তিনি মগধ ও মিথিলা জয় করেছিলেন। ভাগলপুরের একটি লেখ থেকেও জানা যায় যে, অন্তত মগধের কিয়দংশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। তা ছাড়া মগধে রাজত্বকারী শেষ পালরাজ *গোবিন্দ পাল* বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই রাজ্যহারা হন। সুতরাং এ বিষয়েও তাঁর কিছুটা কৃতিত্ব ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তা ছাড়া তিনি বর্তমান চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন।

সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ও সমাজসংস্কারক হিসেবে বল্লাল সেনের সুখ্যাতি ছিল। তিনি স্বয়ং *'দানসাগর'* ও *'অদ্ভুতসাগর'* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দুটিতে তিনি হিন্দু আচার ও ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনিই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ড. *নীহাররঞ্জন রায়ের* মতে, কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তন করে তিনি জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি করেছিলেন। অনেকের মতে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি এই প্রথার প্রবর্তন করেন। যাই হোক্, এই ঘটনা তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন যে, বল্লাল সেন কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্তক নন। এই প্রথা বল্লাল সেনের প্রায় পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে বাংলার কুলপঞ্জির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। তবে ***দীনেশচন্দ্র সরকারের*** মতে, হয়তো বল্লাল সেন *"আচার, বিনয়, বিদ্যা, বৃত্তি, দান ইত্যাদি গুণের ভিত্তিতে কয়েকটি ব্যক্তি বা পরিবারকে কুলীন মর্যাদা দান করেছিলেন।"*

বল্লাল সেন চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি *'অরিরাজ নিঃশঙ্কশংকর'* উপাধি নেন। বল্লাল সেন ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। আরাকান, নেপাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। শেষ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি গঙ্গাতীরে শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করেন। বল্লাল সেন সম্ভবত ১১৫৮ থেকে ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

❂ লক্ষ্মণ সেন ঃ লক্ষ্মণ সেন সম্ভবত ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্যকাল সম্পর্কে জানার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উভয় প্রকার উপাদানই যথেষ্ট

Scanned by CamScanner

পরিমাণে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত লেখগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোবিন্দপুর তর্পণদিঘি, মাধাইনগর, শক্তিপুর, ভাওয়াল প্রভৃতি লেখ। সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *মিনহাজ-উদ্দিন* রচিত *'তাবাকৎ-ই-নাসিরি'*। এই গ্রন্থ থেকে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষদিককার ঘটনাবলি জানা যায়।

লক্ষ্মণ সেনের লেখ থেকে জানা যায়, তিনি গৌড়, কামরূপ, কাশী ও কলিঙ্গদেশ সেন রাজ্যভুক্ত করেন। পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে তিনি জয়স্তম্ভও স্থাপন করেছিলেন। ড. *মজুমদার* মনে করেন যে, লক্ষ্মণ সেন এইসব রাজ্য জয় করেছিলেন পিতামহ বিজয় সেনের রাজত্বকালে তাঁর সেনাপতি হিসেবে। সম্ভবত তিনি গাহড়বালরাজ *জয়চন্দ্রকে* পরাজিত করেন ও মগধ থেকে বিতাড়িত করেন। এই বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ ছিল গয়া অধিকার। এরপর তিনি গাহড়বাল রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে লক্ষ্মণ সেন যদি গাহড়বালদের পরাজিত না করতেন, তবেই ভারতের পক্ষে মঙ্গল হত । কারণ এই সময়ে উত্তর ভারত মুসলমান আক্রমণ কবলিত হয়েছিল। গাহড়বাল শক্তির পক্ষেই শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করার সম্ভাবনা ছিল। লক্ষ্মণ সেন সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে বিহার ও বাংলায় মুসলিম আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে দেন।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের শেষদিকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তুর্কি-নায়ক কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দিন-মহম্মদ-বিন্-বখতিয়ার-খলজির বাংলা আক্রমণ ও দখল। মিনহাজ উদ্দিনের রচনা থেকে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মিনহাজউদ্দিন ছিলেন দিল্লি-সুলতানির অধীনস্থ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। পরে তিনি লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে দুই বছরের জন্য বসবাস করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। মিনহাজউদ্দিনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ারের বিহার জয় সম্পূর্ণ হবার পর লক্ষ্মণ সেন এই মুসলমান আক্রমণকারীর বিষয়ে জ্ঞাত হন। রাজজ্যোতিষীগণ তাঁকে দেশত্যাগের পরামর্শ দেন, কারণ তাঁরা নাকি গণনার দ্বারা জেনেছেন যে, তুর্কিগণ ওই অঞ্চলও শীঘ্র অধিকার করবে। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন দেশত্যাগ করেননি। তিনি যখন নবদ্বীপে অবস্থান করছেন, তখন বখতিয়ার মাত্র ১৮ জন অনুচরসহ নগরে প্রবেশ করেন। নগরে প্রবেশ করে তারা এমনভাবে ধীরভাবে অগ্রসর হতে থাকে যে, নগরবাসী প্রথমে তাদের মুসলমান বণিক মনে করে। এইভাবে বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদদ্বারে পৌঁছান। ইতিমধ্যে বখতিয়ারের বাকি সেনাদল নগরে পৌঁছায়। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন তখন মধ্যাহ্নভোজনে বসেছিলেন। নগর আক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পেরে নগ্নপদে প্রাসাদের পেছনদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন। এইভাবে নদিয়া মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। লক্ষ্মণ সেন নৌকাযোগে বঙ্গ অভিমুখে প্রস্থান করেন।

বখতিয়ার খলজি মাত্র ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে নদিয়া আক্রমণ করেছিলেন কিনা, কিংবা লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষের মতো প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিনা—বিষয়টি বিতর্কিত। এই কারণে প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে লক্ষ্মণ সেনের চরিত্র ভীরু, কাপুরুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। *কবি নবীনচন্দ্র সেন* লিখেছেন, *"সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে..... সোনার বাংলা রাজা দিলা বিসর্জন।"* চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর তুলিতে লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন দৃশ্য অত্যন্ত দুঃখজনকরূপে চিত্রিত হয়েছে। আপাতভাবে একথা সত্য যে, মাত্র ১৭/১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ খাড়া না-করে লক্ষ্মণ সেন চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মিনহাজউদ্দিন ও ইসামীর বিবরণের মধ্যে নানা অসংগতি খুঁজে

Scanned by CamScanner

পেয়েছেন। *রমেশচন্দ্র মজুমদার, সতীশ চন্দ্র, দীনেশচন্দ্র সরকার* প্রমুখ মনে করেন, মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। মিনহাজউদ্দিন স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সেনের প্রশংসা করেছেন। তিনি লক্ষ্মণ সেনকে *"আর্যাবর্তের রাজাগণের মধ্যে সর্বপ্রধান, হিন্দুস্তানের রায়গণের পুরুষাণুক্রমিক খলিফা স্থানীয়"* বলে বর্ণনা করেছেন। যোদ্ধা হিসেবে অকৌমার যুদ্ধসহ নানা রণাঙ্গনে তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রমাণ ইতিহাসে আছে। এমন একজন শাসক মাত্র অষ্টাদশ যবন সেনার ভয়ে ভীত হয়ে রাজধানী ত্যাগ করে পলায়ন করবেন—একথা বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবত, মুসলিম যোদ্ধাদের নৈপুণ্য এবং ভারতীয় শাসকের দুর্বলতা প্রকাশ ও প্রচার করার বাসনায় মুসলিম লেখকেরা ঘটনাটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতে উন্নতমানের ঘোড়ার প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। তাই সুযোগ নিয়ে ছলনার মাধ্যমে আকস্মিক আক্রমণ ঘটিয়েছিলেন। একথা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হবে না যে, অষ্টাদশ অশ্বারোহীকে একটি বৃহত্তর বাহিনী অনুসরণ করছিল। তাই অশ্বারোহীদের প্রাসাদ দখলের মুহূর্তেই প্রাসাদবাসীরা নগরের মধ্যে ভীত মানুষের কোলাহল শুনতে পেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেন কাপুরুষ ছিলেন না, তার প্রমাণ প্রাসাদ ত্যাগ করলেও তিনি রাজত্ব ত্যাগ করেননি। রাজ্যের অন্যপ্রান্তে গিয়ে তিনি পুনরায় শাসন কায়েম করেছিলেন।

এঁদের মতে, ইখতিয়ারউদ্দিনের বিজয় ছিল পতনমুখী ভারতীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুর্কি-মুসলমানদের বিজয় অভিযানের স্বাভাবিক পরিণতি। অবশ্য স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষ্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং নিয়তিতে বিশ্বাসী বাঙালিজাতির পলায়নী মনোবৃত্তি এজন্য অনেকটাই দায়ী ছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কর্তব্যে অবহেলা, সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তাও এই পতনের জন্য দায়ী ছিল।

বখতিয়ার কর্তৃক নদিয়া আক্রমণের ঘটনাটি ঘটেছিল ১২০২ খ্রিস্টাব্দে। এরপর তিনি বিক্রমপুর থেকে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ শাসন করতে থাকেন। *'সদুক্তি কর্ণামৃত'* থেকে জানা যায়, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন। হয়তো এর অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন কবি ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ *'অদ্ভুতসাগর'* তিনিই সমাপ্ত করেন। *'গীতগোবিন্দ'* রচয়িতা জয়দেব *'পবনদূত'* রচয়িতা ধোয়ী, ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ হলায়ুধ প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিত ও দার্শনিক তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। কারণ তিনি *'পরম বৈষ্ণব'* অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন 'গৌড়েশ্বর', *'অরিরাজ-মদন-শংকর'* ইত্যাদি অভিধাও গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র *বিশ্বরূপ সেন* ও *কেশব সেন* দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে কিছুকাল শাসন করেন। তবে এঁদের বা পরবর্তী সেনরাজাদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবত এঁরা খুবই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন।

Scanned by CamScanner